বিশ্বজোড়া ফাঁদ পেতেছ

দিলীপ কুমার সিংহ

পুনশ্চ
৯এ, নবীন কুণ্ডু লেন
কলকাতা - ৭০০ ০০৯

ভূমিকা

বিশ্বভারতীতে ছ'বছর উপাচার্য হিসেবে থাকার জন্য অনেকেই আশা করেছেন আমি যেন প্রাসঙ্গিক কিছু বিষয়ে লিখি। এই রকম আশা জোরদার হয়েছে বোধ হয় অধ্যাপক নিমাইসাধন বসুর 'ভগ্ননীড়' প্রকাশের পর। এ কথা অবিসংবাদিতভাবে ধরে নেওয়া যেতে পারে বিশ্বভারতীর ভাবমূর্তি যাই হোক না কেন, ঐখানে থাকাকালীন ভাবনাচিন্তার লেনদেন অবশ্যম্ভাবী। বিশ্বভারতীকে অন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো মামুলীভাবে দেখলে, তথাকথিত তুলনার কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে দেখলে, নানা দিক থেকে বিশ্বভারতীকে ছোটই করা হবে। বিশ্বভারতীর বিশ্বজনীন আবেদন কোথায়, আপাতদৃষ্টিতে কিছু কি খোয়া গেছে, আমলাতন্ত্রের বা রাজনীতির সচরাচর দৃষ্টিভঙ্গী বা এমনকি সেখানকার সমাজের ক্ষীণ-দৃষ্টিভঙ্গীর শিকার হয়েছে কিনা, তা নিয়ে বক্তব্য শুরু করলে বিতর্ক থেকে অব্যাহতি মিলবে না। সেদিকে অগ্রসর না হয়ে ইতিবাচক দিক থেকে বিশ্বভারতীর পঠনপাঠনশৈলীর যে বর্ষব্যাপী নানা অনুষ্ঠান একটি বড় অঙ্গ, তা বিশ্বভারতীর সনদেও আছে, যার নজির বা অস্তিত্ব আর তথাকথিত বিশ্ববিদ্যালয়ে পাওয়া যাবে না। এই পুস্তকটির মুখ্য উদ্দেশ্য হল এই অনুষ্ঠানগুলির গুরুত্বকে উপস্থাপনা করা। স্বাভাবিকভাবেই, বাইশে শ্রাবণ ব্যতীত নববর্ষ, ৭ই পৌষের ব্রহ্মোপাসনা এবং, ৬ই মাঘের মহর্ষি-স্মরণ প্রত্যেকটির মন্দিরে উপাসনার পথিকৃৎ গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং। এইসব অনুষ্ঠানগুলিতে রবীন্দ্রনাথের ভাষণ গভীরভাবে স্মতর্ব্য তো বটেই, বর্তমান যুগ-সন্ধিক্ষণে সেগুলির অনুকূল প্রাসঙ্গিকতা তুলে ধরা বিশ্বভারতীর নেতৃত্বের বিশেষ কর্তব্য, বিশেষ করে উপাচার্যের। এই সংকলনে তাই অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে উপাসনায় উপস্থাপিত উপাচার্যের বক্তব্যগুলিকে। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, এগুলির মধ্যে বেশ কিছু মিল আছে। হয়ত ভাবে বা ভাষায় বা কবিতা-সংযোজনে — তবে সব বক্তব্যই সামগ্রিকতা অর্জন করেছিল আনুষঙ্গিক ও প্রাসঙ্গিক সংগীত পরিবেশনায়। সংগীত ভবনের অধ্যাপক ও শিল্পীদের নিকট আমার বিশেষ কৃতজ্ঞতা প্রথমেই জানাই, বিশেষ করে ব্রহ্মোপাসনায়; শেষ পাঁচটি বছর তো বটেই, নানা ধরনের ব্রহ্মসংগীত গাওয়ার জন্য। অনেক বক্তব্যের প্রাক্কালে আমি খসড়া, গানের নির্বাচন, অনুষ্ঠানের ক্রম ইত্যাদি সম্পর্কে পরামর্শ পেয়েছি। এই উদারচিত্ত ব্যক্তিদের মধ্যে যারা আমার কাছে বিশেষ কৃতজ্ঞতাভাজন, তাঁরা হলেন অধ্যাপক সিতাংশু রায়, অধ্যাপক অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য, অধ্যাপক গৌতম ভট্টাচার্য ও অধ্যাপক অরূপ বন্দ্যোপাধ্যায়।

এই সংকলনের উপরোক্ত মূল উদ্দেশ্য অনুযায়ী আরো চারটি অধ্যায়ে কয়েকটি প্রবন্ধের অন্তর্ভুক্তি হয়েছে। প্রথমে নাম করি, রবীন্দ্রনাথ ও বিশ্বভারতী, তারপরে কয়েকজন ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে, যাঁদের মধ্যে মাদার টেরেসা ও ডঃ ত্রিগুণা সেনের উদ্দেশ্যে মন্দিরে প্রদত্ত উপাসনার ভাষণগুলি তৃতীয় অধ্যায়ে রাখা হয়েছে। চতুর্থ অধ্যায়ে শিক্ষা বিষয়ে কয়েকটি প্রবন্ধ অর্ন্তভুক্ত করা হয়েছে। শেষ অধ্যায়ে 'বিবিধ রচনা'-এ স্থান পেয়েছে বিভিন্ন ধরনের প্রবন্ধ।

বিশ্বভারতীর ছাত্র বর্তমানে জাপানী বিভাগের অধ্যাপক নীলাঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, উৎসাহী হয়ে প্রকাশনার ত্বরান্বিত করার জন্য উদ্যোগী হয়েছিলেন। তাঁরই ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় লব্ধপ্রতিষ্ঠ প্রকাশক 'পুনশ্চ' সংকলনটি প্রকাশে সম্মত হয়েছে। পুস্তকটির প্রচ্ছদপটটিও নীলাঞ্জনের। আমি নীলাঞ্জনকে সকৃতজ্ঞ স্নেহাশিস্ জানাচ্ছি। 'পুনশ্চ' গোষ্ঠীর সন্দীপ নায়ক ও শাশ্বতী মণ্ডলকে দুজনকেই আমার বিশেষ ধন্যবাদ প্রকাশনা ত্বরান্বিত করার জন্য। বইটির বেশ কয়েকটি প্রবন্ধ বিশ্বভারতীর কয়েকটি প্রকাশনা ও তত্ত্বকৌমুদী, ধর্মতত্ব, প্রমা, সপ্তাহ, সংবাদ প্রতিদিন ইত্যাদি থেকে সংকলিত হয়েছে। এইসকল প্রকাশনগুলির সম্পাদকদের কাছে আমি বাধিত। পরিশেষে জানাই, সংকলনটি সংগ্রহের জন্য পূর্ণ আকার এবং সম্পাদনার কাজে সাহায্য করেছে আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতাদ্বয় দেবপ্রসন্ন ও দেবদত্ত সিংহ এবং এ জন্য আমি তাদের কাছে বাধিত।

দিলীপকুমার সিংহ

৬ই মাঘ, ১৪০৮
মহর্ষি প্রয়াণ দিবস
কলকাতা

সূচীপত্র

প্রথম অধ্যায় ❑ উপাসনা

উপাসনা ঃ নববর্ষ ১৪০৩ ..... ১৩
উপাসনা ঃ নববর্ষ ১৪০৫ ..... ১৭
উপাসনা ঃ নববর্ষ ১৪০৭ ..... ১৯
উপাসনা ঃ নববর্ষ ১৪০৮ ..... ২২
উপাসনা ঃ ২২ শ্রাবণ ১৪০২ ..... ২৫
উপাসনা ঃ ২২ শ্রাবণ ১৪০৪ ..... ২৯
উপাসনা ঃ ২২ শ্রাবণ ১৪০৫ ..... ৩২
উপাসনা ঃ ২২ শ্রাবণ ১৪০৬ ..... ৩৫
ব্রহ্মোপাসনা ঃ ৭ পৌষ ১৪০২ ..... ৪০
ব্রহ্মোপাসনা ঃ ৭ পৌষ ১৪০৩ ..... ৪৭
ব্রহ্মোপাসনা ঃ ৭ পৌষ ১৪০৪ ..... ৫৩
ব্রহ্মোপাসনা ঃ ৭ পৌষ ১৪০৫ ..... ৫৮
ব্রহ্মোপাসনা ঃ ৭ পৌষ ১৪০৬ ..... ৬৩
ব্রহ্মোপাসনা ঃ ৭ পৌষ ১৪০৭ ..... ৬৭
উপাসনা ঃ মহর্ষি স্মরণ ঃ ৬ মাঘ ১৪০৪ ..... ৭২
উপাসনা ঃ মহর্ষি স্মরণ ঃ ৬ মাঘ ১৪০৫ ..... ৭৪
উপাসনা ঃ মহর্ষি স্মরণ ঃ ৬ মাঘ ১৪০৬ ..... ৭৭

দ্বিতীয় অধ্যায় ❑ রবীন্দ্রনাথ ও বিশ্বভারতী

বিশ্বভারতীর হেরফের ঃ কিছু কথা ৮১
বিশ্বভারতী আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান হয়ে উঠবে ৮৩
রবীন্দ্রনাথ ও সমবায় উদ্যোগ ৮৬
রবীন্দ্রনাথকে ফিরে খোঁজা ৮৯
শিক্ষা ভাবনা ঃ রবীন্দ্রনাথ ও বিবেকানন্দ ৯১
পৌষমেলায় প্রাণের হাওয়া বয় ৯৩

তৃতীয় অধ্যায় ❑ কয়েকজন ব্যক্তিত্ব

গান্ধীজি কি এখন্ প্রাসঙ্গিক? ৯৭
নেতাজী সুভাষ ৯৯
দিলীপকুমার রায় ঃ জন্মশতবার্ষিকী ১০১
অন্য নীরদ সি ১০৩
ড: ত্রিগুণা সেন স্মরণে ১০৯
মাদার টেরেসা ১১১
গোপালদা ১১৪
কাজুও আজুমা ১১৬

চতুর্থ অধ্যায় ❑ শিক্ষা সম্পর্কে

প্রসঙ্গ ঃ শিক্ষা ১১৯
শিক্ষা কোন পথে? ১২৫
শিশু শিক্ষা ১২৭
প্রযুক্তি ও পরিপূরক-সম্পূরক শিক্ষাব্যবস্থা ১২৯
বিদ্যালয়-অতিরিক্ত ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা ১৩৪

পঞ্চম অধ্যায় ❑ বিবিধ রচনা

আন্তর্বিষয়ের বুনিয়াদ ১৩৭
যে সব বই খুঁজি ১৩৯
আবৃত্তিলোক ঃ কবিতা উৎসব ১৪১
বাক্সমিতি ১৪৩
স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছর পূর্তির চেহারা ১৪৫
কার্গিলে শহিদদের উদ্দেশ্যে ১৪৭
বাংলা চিত্রগীতির বিবর্তন আছে কি? ১৪৯
ফিল্মীজগতে নৃত্যের বিবর্তন ১৫১

প্রথম অধ্যায়

উপাসনা

উপাসনা ঃ নববর্ষ ১৪০৩

প্রবাহমান অনাদি অনন্ত কালের মধ্যে বঙ্গাব্দের হিসাবটুকু অতি তুচ্ছ। তবু, গতকাল সান্ধ্য উপাসনায় আমরা ১৪০২ বঙ্গাব্দ-কে বিদায় দিয়েছি। আজ প্রভাতে আমাদের উপাসনা ১৪০৩ বঙ্গাব্দকে বরণ করে নেবার জন্যে।

গুরুদেব রবীন্দ্রনাথের স্মৃতিধন্য এই মন্দিরে বসে তাঁর গানের মাধ্যমেই ভূমানন্দে আমরা প্রণাম করি অসীম ব্রহ্মকে নববর্ষের এই শুভ লগ্নে। অসীম কালকে আমরা আমাদের সীমিত মাপে ঐতিহাসিক কালের মাপে মেপে নিই। সে শকাব্দই হোক, বিক্রমাব্দই হোক, খ্রিস্টাব্দই হোক, হিজরী সনই হোক, আর বঙ্গাব্দই হোক। বঙ্গাব্দের হিসাবে আমরা চতুর্দশ শতাব্দ পার হয়ে পঞ্চদশ শতাব্দের তৃতীয় বর্ষে আজ পা দিলাম। সর্বজনীন সুবিধার্থে পৃথিবী জুড়ে খ্রিস্টাব্দের প্রচলনই বেশি। আর তিন বছর কয়েক মাস পর আমরা বিংশ শতক পার হয়ে একবিংশ শতকে প্রবেশ করব। শুধু তাই নয়, দুই সহস্রাব্দে (millenium) পার হয়ে তৃতীয় সহস্রাব্দে প্রবেশ করব। দেশে, বিশেষভাবে শিক্ষিত সমাজে শুরু হয়ে গেছে প্রথম ও দ্বিতীয় সহস্রাব্দের মানব সভ্যতার গতির পর্যবেক্ষণ ও আসন্ন তৃতীয় সহস্রাব্দে প্রবেশের প্রস্তুতি। শুরু হয়ে গেছে নতুন দৃষ্টিভঙ্গিতে ইতিহাস লেখা, আধুনিক-উত্তর (post-modern) কালের দর্শনের ক্ষেত্রানুসন্ধান, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকলার সঙ্গে সঙ্গে মানব চেতনার মূল্যবোধের স্বীকৃতি ও অনুশীলন।

শুধু সহস্রাব্দ কেন, প্রাচীন ভারতীয় জ্যোতির্বিদরা আরো অনেক বড়ো মাপের কাল গণনা রেখে গেছেন। সে হচ্ছে যুগ, কল্প ও কল্পান্তের হিসাব। সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি এই চার যুগ। বৈশাখের শুক্লপক্ষে অক্ষয় তৃতীয়ায় রবিবারে সত্যযুগের শুরু। সতেরো লক্ষ আটাশ হাজার বৎসর ছিল সত্যযুগের দৈর্ঘ্য। কার্ত্তিকের শুক্ল নবমীতে ত্রেতাযুগ শুরু। বারো লক্ষ ছিয়ানব্বই হাজার বৎসর ছিল এর দৈর্ঘ্য। ভাদ্রের কৃষ্ণ ত্রয়োদশীতে বৃহস্পতিবারে দ্বাপর যুগের উৎপত্তি। এর সময়সীমা ছিল আট লক্ষ চোষট্টি হাজার বৎসর। তারপর এক মাঘী পূর্ণিমায় শুক্রবারে কলিযুগ শুরু হল। এর সময়সীমা আনুমানিক চার লক্ষ বত্রিশ হাজার বৎসর। তার মধ্যে গত হতে চলেছে মাত্র ছয় হাজার বৎসর। সত্য যুগে সমস্তই ছিল পুণ্য। ত্রেতা যুগে এক পাদ পাপ প্রবেশ করেছিল, পুণ্য ছিল তিন পাদ। দ্বাপর যুগে পাপপুণ্য ছিল সমানে সমানে। কলি যুগে তিন পাদ পাপ। এক পাদ পুণ্য। লক্ষ্যণীয়, চারটি যুগের প্রতিটির সময়সীমা ক্রমশ কমে আসছে, পুণ্যের তাপও এক পাদ কমে আসছে। তবু সবই পাপময় নয়। এক পাদ পুণ্য অন্তত বর্তমান। সংগীত, বৈদিক মন্ত্র ও অনন্তের ধ্যানের অধিকার এখনো আমরা হারাইনি। মানুষ তো অমৃতের পুত্র। আবার সত্যযুগ আসবে। পূর্ণ পুণ্যের প্রতিষ্ঠা ঘটবে। এই যে যুগ চতুষ্টয়ের আবর্তন, এও তো মানুষের নির্ধারিত হিসাব।

মহাবিশ্বের স্রষ্টা প্রজাপতি ব্রহ্মার এক দিন এক রাত্রিতে মানুষের আটশো চৌষট্টি কোটি বৎসর। প্রাচীন ভারতীয় গণকরা এই সময়সীমাকে বলেছেন কল্প। এই বিরাট কালাবর্তে মানবজীবন অত্যন্ত ক্ষণস্থায়ী, তা সে যত বেশি পরমায়ু নিয়েই আসকু না কেন। তবু সে হার মানেনি। নিজের জন্মমৃত্যুর বন্ধনীর মধ্যে সে আবদ্ধ নয়। রূপ, রস, প্রেম, গান সে সৃষ্টিও করে সম্ভোগও করে। এক জীবনেই সে জন্ম-জন্মান্তর ঘটিয়ে নেয়। তার 'ছোট আমি'-কে সংসারে রেখে 'বড়ো আমি'-কে প্রসারিত করে দেয় কালের ঢেউয়ে মহাকাশের অসীম অনন্ত। সেও তো প্রজাপতি ব্রহ্মারই সগোত্র। আর্য ঋষিরা উপলব্ধি করে গেছেন, ভূমা বাইরের আয়তনে নয়, অমৃত পুত্র মানবের চৈতন্যময় পরিপূর্ণতায়। আমাদের গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ কল্প-কল্পান্তরে জ্যোতিষ্কময় মহাবিশ্বে মানবের ভূমিকাকে কীভাবে মূল্যায়িত করেছেন তাঁরই ভাষায় শোনা যাক ঃ

"নূতন কল্পে
সৃষ্টির আরম্ভে আঁকা হল অসীম আকাশ
কালের সীমানা
আলোর বেড়া দিয়ে।
সবচেয়ে বড়ো ক্ষেত্রটি
অযুত নিযুত কোটি বৎসরের মাপে।
সেখানে ঝাঁকে ঝাঁকে
জ্যোতিষ্ক-পতঙ্গ দিয়েছে দেখা,
গণনায় শেষ করা যায় না।
তার কোন প্রথম প্রত্যুষের আলোকে
কোন গুহা থেকে উড়ে বেরোল অসংখ্য,
পাখা মেলে ঘুরে বেড়াতে লাগল চক্রপথে
আকাশ থেকে আকাশে।

অব্যক্ত তারা ছিল প্রচ্ছন্ন,
ব্যক্তের মধ্যে ধেয়ে এল
মরণের ওড়া উড়তে;
তারা জানে না কিসের জন্যে
এই মৃত্যুর দুর্দান্ত আবেগ।
কোন কেন্দ্রে জ্বলছে সেই মহা আলোক
যার মধ্যে ঝাঁপ দিয়ে পড়বার জন্যে
হয়েছে উন্মত্তের মতো উৎসুক।
আয়ুর অবসান খুঁজছে আয়ুহীনের অচিন্ত্য রহস্যে।

ধরার ভূমিকায় মানব-যুগের
সীমা আঁকা হয়েছে
ছোট মাপে

আলোক-আঁধারের পর্যায়ে
নক্ষত্রলোকের বিরাট দৃষ্টির
অগোচরে।
সেখানকার নিমেষের পরিমাণে
এখানকার সৃষ্টি ও প্রলয়।

বড়ো সীমানার মধ্যে মধ্যে
ছোট ছোট কালের পরিমল
আঁকা হচ্ছে মোছা হচ্ছে।

আমি পেয়েছি ক্ষণে ক্ষণে অমৃতভরা
মুহূর্ত গুলিকে,
তার সীমা কে বিচার করবে
তার অপরিমেয় সত্য
অযুত নিযুত বৎসরের।

নক্ষত্রের পরিধির মধ্যে,
ধরে না;
কল্পান্ত যখন তার সকল প্রদীপ নিবিয়ে
সৃষ্টির রঙ্গমঞ্চ দেবে অন্ধকার করে
তখনো সে থাকবে প্রলয়ের নেপথ্যে
কল্পান্তরের প্রতীক্ষায়"

(শেষ সপ্তক, একুশ)

তাই, ১৪০৩ বঙ্গাব্দের বৈশাখের এই প্রথম দিনটি মহাকালের তীরের গতির মধ্যে একটি বিন্দু পরিমাণ হলেও আমরা যদি উপাসনার এই মুহূর্তটিকে অমৃতময় করে তুলতে পারি তা হলে তা নগণ্য নয়, বরং আমাদের জীবনগতির বাঁকে এক মহামূল্য লগ্ন। আমাদের জড়তা তামস কেটে যাক। আদি জ্যোতির সম্পদে আমাদের চিত্ত পূর্ণ হোক। অনন্ত আকাশে দিনকর চন্দ্র তারা দুলছে। তা কি শুধু শক্তির কম্পন জ্যোতিলোকের ঝর্ণাধারার সঙ্গে অবিরত চেতনাধারা প্রবাহিত। জগৎবিবর্তনে মানব চেতনা সেই চেতনাধারারই ফলশ্রুতি।

"প্রথম প্রাণের বহ্নি উৎস থেকে
নেমেছে তেজোময়ী লহরী,
দিয়েছে আমার নাড়ীতে
অনির্বচনীয়ের স্পন্দন।
আমার চৈতন্যে গোপনে দিয়েছে নাড়া
অনাদিকালের কোন অস্পষ্ট বার্তা,
প্রাচীন সূর্যের বিরাট বাষ্পদেহে বিলীন
আমার অব্যক্ত সত্তার রশ্মি স্ফুরণ।

বিস্ময়ে আমার চিত্ত প্রসারিত হয়েছে অসীম কালে
যখন ভেবেছি
সৃষ্টির আলোকতীর্থে
সেই জ্যোতিতে আজ আমি জাগ্রত
যে জ্যোতিতে অযুত নিযুত বৎসর পূর্বে
সুপ্ত ছিল আমার ভবিষ্যত"
(পত্রপুট, পনেরো)

এ তো ত্রিকালজ্ঞ ঋষির বাণী। হয়তো তাঁদের থেকেও অধিকতর ক্রান্তদর্শী আমাদের বিশ্বকবি। অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যতের ঊর্ধ্বে মহাকাল ও মহাকাশের সম্মিলিত বিশ্বরূপ মানবচৈতন্যে একীভূত হয়ে ধরা দিয়েছে। "মানুষের অহংকারপটেই বিশ্বকর্মার বিশ্বশিল্প" (আমি, শ্যামলী)— এ কী গভীর বাণী! মানুষ এখানে কত মহিমান্বিত আমাদের তো অন্য গুরুকরণের প্রয়োজন নেই। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথই আমাদের পরমপ্রিয় গুরুদেব। তাঁর কাব্য, তাঁর গান, তাঁর বাণীই আমাদের দীক্ষামন্ত্র "আকাশ হতে আকাশপথে ঝরছে জগৎ ঝর্ণাধারার মতো"— এ গান তো গায়ত্রীমন্ত্রেরই সংগীতময় রূপ।

আমরা মন্দিরে প্রথাগত আরতি দেখতে অভ্যস্ত। কবি দেখেছেন মহাজাগতিক (cosmic) আরতি। চন্দ্র-তপন-গ্রহনক্ষত্র মহাবিশ্বের অধীশ্বরকে আরতি করে চলেছে অবিরত। কী অসাধারণ উৎপ্রেক্ষা (extended metaphor)? আমরাও তো সেই আরতির চৈতন্যময় অংশীদার। চৌতালে বাঁধা "তাঁহারে আরতি করে চন্দ্রতপন" গানটি সেই আরতিরই সুরছন্দপূর্ণ ফলিত রূপ। পৃথিবীর সূর্যপ্রদক্ষিণে একটি বৎসর। বৎসরে বারোটি মাস, ছয়টি ঋতু। চৌতালেও বারোটি মাত্রা, ছয়টি ভাগ দুই দুই করে। মৃদঙ্গের তালাবর্তের মতো ধরণীর বাৎসরিক কালাবর্তে ঘুরে ঘুরে সম পড়ছে বৈশাখের প্রথম দিনটির সুপ্রভাতে।

কবির বাণী দিয়েই এই সম্ভাষণটুকু শেষ করা যাক।

"আমার গানের মধ্যে সঞ্চিত হয়েছে দিনে দিনে
সৃষ্টির প্রথম রহস্য, আলোকের প্রকাশ,
আর সৃষ্টির শেষ রহস্য, ভালোবাসার অমৃত
আমি ব্রাত্য আমি মন্ত্র হীন,
সকল মন্দিরের বাহিরে
আমার পূজা আজ সমাপ্ত হল
দেবলোক থেকে মানবলোকে
আকাশে জ্যোতির্ময় পুরুষে
আর মনের মানুষে আমার অন্তরতম আনন্দে"।

উপাসনা ঃ নববর্ষ ১৪০৫

"যাঁ হতে বাহিরে ছড়ায়ে পড়িছে
পৃথিবী আকাশ তারা
যাঁ হতে আমার অন্তরে আসে
বৃদ্ধি চেতনা ধারা
তাঁরি পূজনীয় অসীম শক্তি
ধ্যান করি আমি লইয়া ভক্তি"

আজকের মত দিনের উপাসনার ভূমিকা শুরু করার আগে আমার প্রথম কর্তব্য হল সূর্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী গায়ত্রী-কে প্রণাম করা। তাই করে গত বৎসরের এমনি দিন থেকে শুরু করে আমাদের ধরিত্রী মাতার আরও একবার সূর্য প্রদক্ষিণ সম্পূর্ণ করা হল। ধরিত্রী মাতার কোলে আছি বলেই আমরাও নিজেদের অজান্তে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করলাম এবং তা করে চলেছি বছরের পর বছর। এইভাবে আমরা কত লক্ষ বৃত্তপথে মহাশূন্যে ভেসেই চলেছি। অথচ আমরা সবাই একটি অসাধারণ শৃঙ্খলায় আবদ্ধ।

প্রত্যেক বছরেই এমনি দিনে নতুন বছরের শুভ প্রত্যুষে আশ্রম পরিক্রমা করতে করতে আমরা গান গেয়ে থাকি

ভেঙেছে দুয়ার, এসেছ জ্যোতির্ময়
তোমারই হউক জয়
তিমির বিদায় উদার অভ্যুদয়
তোমারই হউক জয়

উপাসনার সার্থকতা সেইখানেই যখন আমাদের চিত্তাকাশ জ্যোতির্ময়ের জ্যোতিতে আলোকিত হয়ে ওঠে।

মহাবিশ্বের বিবর্তন ঘটে চলেছে স্বাভাবিক নিয়মে। আর মানুষ হল মহাসৃষ্টির বোধ করি শেষতম ও উৎকৃষ্টতম জীব। আমাদের ঠাঁই দিয়ে বা ধারণ করে পৃথিবী গ্রহ হিসেবে হয়েছে ধন্য এবং তাই তাকে বলি ধরিত্রী। মানুষকে তাই আমরা দেখি পৃথিবীর অংশ হিসাবে, সূর্যের অংশ হিসাবে, এমনকি মহাবিশ্বেরও অংশ হিসাবে। যতই ছোট হোক না কেন তার দেহ, যতই সীমিত হোক না কেন তার আয়ু, সে কিন্তু অভিনব এবং অনন্য তার চেতনা শক্তির সম্পদে। সে হয়তো অর্বাচীন পার্থিব জীবনের দৃষ্টিতে। কিন্তু সামগ্রিকভাবে অংশীদার হিসাবে মানুষ হল অতি প্রাচীন। মানুষের সত্তার একটা বিরাটত্ব এবং উৎকর্ষ আছে বলেই, মহা সৃষ্টির বহু যুগের ইতিহাস সার্থকতা লাভ করেছে এই সত্তার মধ্যেই এসে। সেই জন্যই মানুষ হল ভূমাময়। আমরা অর্থাৎ মানুষরা নিজেকে ক্ষুদ্র করে ফেলি নানা স্বার্থের কোলাহলে। আজকের এই নববর্ষের নব প্রভাতে আমরা যেন এই উপলব্ধি করতে সচেষ্ট হই। যাঁর মৃত্যু নেই সেই অমৃতেরই সন্তান আমরা, তাই আমরা হলাম বিশ্ববিধাতারই স্বগোত্র। বিচ্ছিন্নতা নয়, সামঞ্জস্যই যেন হয় আমাদের নীতি ও কর্মশৈলী। যিনি তেজময় তিনি আবার একাধারে অমৃতময়। তাঁকে না জানলে আমরা কীভাবে মৃত্যুকে অতিক্রম করতে সক্ষম হব। বেদজ্ঞান থেকে ব্রহ্মবিদ্যা অর্জন করতে পারি তখনই, যদি আমরা একটু সংবেদনশীল হই। আমাদের গুরুদেব শুধু ব্রাহ্মণদের মধ্যে ব্রহ্মবিদ্যাকে আয়ত্তের মধ্যে